দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 1 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রসঙ্গঃ জাতীয়, উন্মুক্ত ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন সরকার
অধ্যক্ষ, নওগাঁ সরকারী মহিলা কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান। গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত উচ্চ শিক্ষার প্রতি সরকারের সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ। যদিও প্রথমোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দুটি প্রতিষ্ঠার কথা অনেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বেশ কিছু লেখালেখিও হয়েছে। মানুষভেদে দেখার দৃষ্টিকোণ পৃথক হয়; যিনি দেখেন তার সামাজিক অবস্থান, পেশা, পরিবেশ ইত্যাদি তার অবলোকনকে প্রভাবিত করে। এতে আপত্তির কিছু নেই, খারাপ কিছু বলা যাবে না। কিন্তু যদি স্বার্থহানীর আশঙ্কা বা স্বার্থসিদ্ধির আশায় কেউ ইচ্ছে করেই ভালটা না দেখে শুধু খারাপটাই দেখেন এবং দেখান তাহলে সেটাকে কিছুতেই ভাল বলা যাবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এরকম কিছু ব্যাপার পত্র-পত্রিকায় লক্ষ্য করা গেছে। টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন তাদের নিজেদের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া, পরীক্ষা নেয়া, যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল এবং ফলশ্রুতিতে অধিভুক্ত কলেজগুলোর দিকে ঠিকমত মনোযোগ দিতে পারছিল না, তখনই একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা চিন্তা করা হয়। যেটি কলেজগুলোর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার মানকে নির্ধারণ করবে, পরীক্ষা নেবে এবং যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে ডিগ্রী দেবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় নামে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে এটাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কলেজগুলোর যথাসময়ে পরীক্ষা নিয়ে ডিগ্রী প্রদানের ব্যর্থতাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মূল কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অভ্যন্তরীণ গোলযোগে এবং রাজনৈতিক কারণে যখন মাসের পর মাস বন্ধ থেকেছে তখন কলেজগুলোতে পড়াশুনা মোটামুটিভাবে এগিয়ে গেছে। কিন্তু আগেভাগে পরীক্ষা নিয়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রী দেয়ার পরিবর্তে এদেরকে পিছুটেনে রাখা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কলেজেও প্রবেশ করেছে। অনির্ধারিত বন্ধ কলেজ-সমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক কম। অধিভুক্ত কলেজসমূহের একাডেমিক দিক নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সবসময় একটা উটকো ঝামেলা হিসেবে দেখা দিয়েছে। স্নাতক-পাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না। অথচ এই কোর্সের মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ তাদের এখতিয়ারে। এ কারণেই বিশ্ববিদ্যা-লয় যেমন এর প্রতি যথাযথ নজর দিতে পারেনি তেমনি এই উটকো ঝামেলায় তাদের নিজেদের ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঝামেলা নেই বলেই বোধহয় তাদের সেশনজট সবচেয়ে কম।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কলেজগুলোর পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়-নের জন্য কোন পরিকল্পনা এখানে নেই। তারা নিজেদের শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। হয়ত এটাই স্বাভাবিক; যেখানে নিজেদের শিক্ষা কর্মসূচীর যথোচিত উন্নতি করার অর্থ পাওয়া কঠিন, সেখানে অন্যদিকে দৃষ্টি দেয়ার চেষ্টাটাও কম হবে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষ না দিয়ে তাদের ঝামেলা মুক্ত করার জন্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করছে। কলেজ-গুলোর স্নাতক-পাস, সম্মান এবং স্নাত-কোত্তর কোর্স সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যেই এই বিকল্প ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্ষমতার পরিধি সংকোচনের কোন উদ্দেশ্য থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে না বলেই আমার বিশ্বাস। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা দরকার। শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ করে ডিগ্রী দেয়ার মধ্যেই যেন এর কার্যক্রম আটকা থেকে শিক্ষা বোর্ডগুলোর মত একটি "উচ্চ শিক্ষা বোর্ডে" পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কলেজগুলোর শিক্ষাদানের মানকে সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয় নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার দিকে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দিতে হবে। তবে অধির্ভুক্ত কলেজগুলো যাতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তোর পর্যয়ের পঠন-পাঠনে আরও ভালভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে তার জন্য এদেরকেও ঝামেলামুক্ত করার দরকার আছে। সব কলেজেই স্নাতক পর্যয়ের পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স পড়ানো হয়। উচ্চতর অধ্যয়ণে বেশি মনোযোগ দিতে হলে অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ বলে পরিচিতি দানকারী কলেজগুলোকে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠদান থেকে অব্যাহতি দেয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীকে স্কুলের সাথে যুক্ত করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরদারিতে এদেরকে শুধু স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর অধ্যয়নে নিমগ্ন রাখা প্রয়োজন।

দেশে প্রথম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বিশেষ স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে উচ্চ শিক্ষার অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ না রেখে বাড়িতে বসে জ্ঞানার্জন এবং ডিগ্রীলাভের সুযোগ সৃষ্টি করা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিভাবক ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুটা ভুল ধারণা আছে বলে মনে হয়। তারা এই প্রতিষ্ঠানকে টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে দেখছেন। ভাবছেন, এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য ছুটাছুটি করতে হবে না। কোচিং সেন্টারগুলোতে ভিড় জমিয়ে ভর্তি প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে না। কিন্তু বিষয়টি বোধহয় তা নয়। প্রচলিত স্নাতক-সম্মান বা স্নাতকোত্তর কোর্স সম্ভবত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে পারে না। বিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণাগারে হাতেকলমে কাজ করার যে প্রয়োজনীয়তা আছে বা গবেষণাকাজে গাইডের যে ভূমিকা আছে তা এই বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারবে না বলেই মনে হয়। একে মূলত পেশাগত কোর্স শিক্ষাদানেই রত থাকতে হবে। যেমন, শিক্ষকদের জন্য বি, এড/এম.এড কোর্স, নার্সিং, কম্পিউটার শিক্ষা ইত্যাদি। বলা হয়ে থাকে, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভোবনের জন্য প্রযুক্তিবিদরা অসহায় হয়ে পড়ছে, তাদের সচল করার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন। কিন্তু আমরা উন্নয়নের যে স্তরে আছি সেখানে কি প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন প্রযুক্তি আমাদের কাজে-কার্মে প্রবেশ করছে? যে দেশে কাঠের লাঙ্গলই এখন পর্যন্ত চাষের মূল হাতিয়ার সেখানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। কাজেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা কমাবে তা আশা করা ঠিক হবে না। বরঞ্চ বৈকালিক বা নৈশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন, শিক্ষক এবং গবেষণাগারগুলোকে সন্ধ্যায় কাজে লাগিয়ে আরও বেশিসংখ্যাক ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনার সুযোগ করে দেয়া যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। আমাদের দেশ গরীব; এখনই উন্নত বিশ্বের অনুকরণে ব্যয়বহুল প্রজেক্ট হাতে না নিয়ে নিজস্ব উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের চেষ্টা করা বাঞ্ছণীয়।

আমরা বেসরকারী মহাবিদ্যালয়, বিদ্যা-লয়ের সাথে পরিচিত। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কাছে অপরিচিত। দেশের শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী বিদ্যালয়, কলেজের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। বস্তুত একদা বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোই শিক্ষা বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করছে। সরকারীকরণের প্রক্রিয়ায় খ্যাতনামা স্কুল-কলেজগুলো সরকারী পরিচালনায় চলে যাওয়ায় অন্তত একটা ক্ষতি হয়েছে-সদাশয় লোকজন আর স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখাচ্ছেনা। এ গুলোকে এখন আর সমাজ সেবামূলক কাজ মনে করা হয় না। বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়াতে পূর্বের মত যদি বাবা-মার স্মৃতি রক্ষার্থে, সমাজ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এগিয়ে আসতেন তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মূলত একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে যাচ্ছে। এখানে পড়ার খরচ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮/১০ গুণ। স্বভাবতই শুধু বিত্তশালীদের পড়াশুনার সুযোগই এখানে থাকবে। ধনগত বৈষম্যকে স্বীকৃতি দিয়ে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। গরীবদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধনীদের শিক্ষালয় আলাদাভাবে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা ক্ষতিকর। এতে সামাজিক ক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। উচ্চ শিক্ষার একমাত্র মাপকাঠি হবে মেধা। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে তার অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। কোথায় যেন পড়লাম, সম্প্রতি ভারতের কোন কোন রাজ্যে বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিষয়টি আমাদেরও ভেবে দেখতে হবে।

যে দেশে কাঠের লাঙ্গলই এখন পর্যন্ত চাষের মূল হাতিয়ার সেখানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। কাজেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা কমাবে তা আশা করা ঠিক হবে না।